



বাল্যবিবাহ ও সাবালকত্বের শরয়ি বয়সসীমা এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সীমানা

"দারুল উলুম করাচির একটি তাত্ত্বিক ফতোয়া"





NOOR
Publication



অর্পণ

“উৎসর্গ করা হলো সেই সকল মুখলিস আসলাফ ও আকাবিরদের প্রতি—যাঁরা এই উপমহাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের হাক্কানিয়ত ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছেন এবং যাঁদের নিষ্পূর্ণ আত্মিক নির্দেশনায় আজও আমরা শরিয়তের সঠিক পথের দিশা ধুঁজে পাই।”

গ্রন্থ বিবরণী

"বাল্যবিবাহ ও সাবালকত্বের শরিয় বয়সসীমা এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সীমানা:
দারুল উলুম করাচির একটি তাত্ত্বিক ফতোয়া"

সংকলন ও অনুবাদ: হাফেজ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ

প্রকাশক: নূর পাবলিকেশন (Noor Publication)

প্রথম প্রকাশ: ১০ই মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বিনিময় মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬ (ছবিবিশ)

ইমেইল: oricef6@gmail.com

নিবেদন

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। এই সংকলনটি নিখুঁত করার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কোনো অসতর্কতা জনিত ভুল বা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। যদি কোনো বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তবে তা আমাদের ইমেইল ঠিকানায় জানিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা গুরুত্বের সাথে সংশোধন করা হবে।



লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর।

বর্তমান সময়ে 'বাল্যবিবাহ' এবং 'সাবালকত্বের বয়সসীমা' নিয়ে মুসলিম সমাজে নানাবিধ অস্পষ্টতা ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে শরিয়তের শাস্ত্রত বিধান, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রেক্ষাপট—এই দুইয়ের সমন্বয়ে একজন মুমিনের করণীয় কী, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে, শরিয়ত নির্ধারিত বয়সের আগে বিবাহ এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দেওয়া নির্দেশনার কতটুকু আনুগত্য করা ওয়াযিব, তা নিয়ে একদল বিজ্ঞ আলেম ও ফকিহগণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা সময়ের দাবি।

এই প্রয়োজন অনুভব করেই আমি বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা ইসলামি বিদ্যাপীঠ 'জামিয়া দারুল উলুম করাচি'-এর দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক ফতোয়া অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

এই ফতোয়াটিতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে:

১. শরিয়তের দৃষ্টিতে একজন ছেলে বা মেয়ের সাবালক হওয়ার প্রকৃত বয়স ও আলামত।
২. সাধারণ বা মুবাহ (পাপ নয় এমন) বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকের নির্দেশ মানার গুরুত্ব ও এর শরয়ি সীমানা।
৩. ফকিহগণের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের আলোকে 'উলুল আমর'-এর আনুগত্যের যৌক্তিক বিশ্লেষণ।

বইটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে— **"বাল্যবিবাহ ও সাবালকত্বের শরয়ি বয়সসীমা এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সীমানা: দারুল উলুম করাচির একটি তাত্ত্বিক ফতোয়া"**। আমি চেষ্টা করেছি মূল ফতোয়ার গাভীর্য ও দলিলসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে। অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে আধুনিক পরিভাষা ও স্পষ্টতা বজায় রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি সাধারণ পাঠক, গবেষক এবং সচেতন মুসলিমদের মনের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলা এই কাজটিকে কবুল করুন এবং আমাদের সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিনীত

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ



সূচিপত্র

ভূমিকা -----	১
বাল্যবিবাহ আইন পাকিস্তান -----	৩
বাল্যবিবাহ আইন বাংলাদেশ -----	৪
দারুল উলুম করাচি পরিচিতি -----	৬
মূল ফতোয়া -----	৭
রাষ্ট্রীয় আইন এবং ধর্মীয় বিধান -----	৮
মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. জীবনী -----	১১
মুফতি সাহবের বক্তব্য -----	১২
আরবী দলিলসমূহ -----	১৮
দলিলের বাংলা অনুবাদ -----	২০



ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় আইন বনাম আল্লাহর বিধান

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর। একজন সচেতন মুসলিমের জন্য এটি ঈমানের দাবি যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন।

বর্তমান যুগে আমরা এমন এক আইনি কাঠামোর মধ্যে বসবাস করছি যেখানে প্রথাগত রাষ্ট্রীয় আইন এবং ইসলামি শরিয়তের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে 'বাল্যবিবাহ' এবং 'বিয়ের ন্যূনতম বয়স' সংক্রান্ত আইনগুলো আমাদের পারিবারিক কাঠামোতে গভীর প্রভাব ফেলছে।

এই বইটির আলোচনার শুরুতেই আমাদের বর্তমান প্রচলিত দেশীয় আইনগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন, যাতে আমরা শরিয়তের সাথে এর পার্থক্য ও সংঘাতের জায়গাগুলো বুঝতে পারি।

বাল্যবিবাহ আইন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ

Punjab Child Marriage Restraint Ordinance, 2026 (I of 2026)

Published in the Punjab Gazette (Extraordinary Issue), 11 February 2026

Notification

Government of the Punjab – Law and Parliamentary Affairs Department Dated: 11 February 2026

No. Legis:13-01/2025 – The following Ordinance promulgated by the Governor of the Punjab is hereby published for general information:

The Punjab Child Marriage Restraint Ordinance, 2026

(I of 2026)

An Ordinance

to restrain the solemnization of child marriages in Punjab.

1. Short title, extent and commencement

(1) This Ordinance may be cited as the Punjab Child Marriage Restraint Ordinance, 2026.
(2) It shall extend to the whole of Punjab. (3) It shall come into force at once.

2. Definitions

(a) "child" means a person, male or female, who is under eighteen years of age; (b) "child marriage" means an act of Nikah or solemnizing marriage where both or either of the contracting party is a child; (c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898); (d) "contracting party" means either of the party whose Nikah or marriage is, or about to be performed or solemnized; (e) "Court" means the Court of Session as provided under the Code; (f) "Government" means Government of the Punjab; (g) "guardian" means a natural guardian or a guardian appointed under the Guardians and Wards Act, 1890 (VIII of 1890); (h) "Ordinance" means the Punjab Child Marriage Restraint Ordinance, 2026.

3. Registration of child marriages

(1) No Nikah registrar shall register a child marriage. (2) Whoever contravenes sub-section (1) shall be punished with simple imprisonment up to one year and fine of one hundred thousand rupees.

4. Punishment for marrying a child

Whoever, being an adult above eighteen years of age, contracts a marriage with a child, shall be punished with rigorous imprisonment of not less than two years and up to three years, and fine up to five hundred thousand rupees.

রেজিস্টার নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০১৭

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Women and Child Affairs

NOTIFICATION

Date : 26 Augrahayana 1424 BE/10 December 2017 AD

S.R.O. No. 344-Law/2017.—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Child Marriage Restraint Act, 2017, the Government is pleased to publish the following English translation of the Act to be called the Authentic English Text of the Act, and it shall be effective from the date on which the Act comes into force under sub-section (2) of section 1 of the Act :

THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT, 2017

(Act No. VI of 2017)

An Act to make afresh a time-befitting law by repealing the Child Marriage Restraint Act, 1929

WHEREAS it is expedient and necessary to make afresh a time-befitting law by repealing the Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No.XIX of 1929);

THEREFORE it is hereby enacted as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Child Marriage Restraint Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

(১৭৩৪৩)

বৃহস্পতিবার ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭

১. পাঞ্জাব বাল্যবিবাহ নিরোধ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (পাকিস্তান প্রেক্ষাপট)

এই অধ্যাদেশটি ২০২৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা এবং নারী-পুরুষের বিয়ের বয়সের বৈষম্য দূর করা। এই আইনের মূল দিকগুলো হলো:

- **বয়সসীমা:** ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো ব্যক্তি (ছেলে বা মেয়ে) এই আইনে 'শিশু' হিসেবে গণ্য হবে।
- **কঠোর শাস্তি:** কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুকে বিয়ে করলে তার ২ থেকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে।
- **অভিভাবকের দায়:** কোনো অভিভাবক এই বিয়েতে সহায়তা করলে বা বাধা দিতে ব্যর্থ হলেও সমপরিমাণ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।
- **সহবাস ও নির্যাতন:** এই আইনে ১৮ বছরের আগে সহবাসকে 'শিশু নির্যাতন' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যার শাস্তি ৫ থেকে ৭ বছরের জেল।

বিচারিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা:

- এই আইনের অধীনে বিচার কেবল সেশন কোর্টে (Court of Session) হবে।
- আদালত বাল্যবিবাহ বন্ধে নিষেধাজ্ঞা (Injunction) জারি করতে পারে।
- মামলাগুলো অ জামিনযোগ্য (Non-bailable) এবং আদালতকে ৯০ দিনের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করতে হবে।

২. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আইনটি ২০১৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **বয়সসীমা:** বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের বয়স ন্যূনতম ২১ বছর এবং নারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে। এর নিচে বিয়ে করাকে 'বাল্যবিবাহ' বলা হয়েছে।
- **শাস্তির বিধান:** কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বাল্যবিবাহ করলে ২ বছরের জেল বা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। বাবা-মা বা অভিভাবক এই বিয়ের আয়োজন করলে তাদেরও ৬ মাস থেকে ২ বছরের জেল হতে পারে।
- **রেজিস্ট্রারের শাস্তি:** কোনো কাজী বা রেজিস্ট্রার বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করলে তার জেল-জরিমানার পাশাপাশি লাইসেন্স বাতিল করা হবে।
- **বিশেষ বিধান (ধারা ১৯):** এই আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, বিশেষ পরিস্থিতিতে আদালতের অনুমতি ও বাবা-মার সম্মতিতে অপ্রাপ্তবয়স্কের বিয়ে সম্ভব, যা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

মামলা ও বিচার:

এই আইনের অধীনে অপরাধগুলো আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable)। মোবাইল কোর্ট বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমেও এখানে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর ১৯ নম্বর ধারায় একটি বিশেষ বিধান বা সুযোগ রাখা হয়েছে অত্যন্ত সীমিত এবং বিশেষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য।



এই বিশেষ সুযোগ সম্পর্কে আইনের ১৯ নম্বর ধারায় যা বলা আছে:

- **বিশেষ পরিস্থিতি:** যদি কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অপ্রাপ্তবয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে বিয়ে দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তবেই এটি সম্ভব।
- **আদালতের নির্দেশ:** এই ধরনের বিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই আদালতের পূর্ব অনুমতি বা নির্দেশনা থাকতে হবে।
- **অভিভাবকের সম্মতি:** বিয়ের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কের বাবা-মা অথবা আইনগত অভিভাবকের সম্মতি থাকা বাধ্যতামূলক।

আইনগত বৈধতা:

যদি এই শর্তগুলো (আদালতের নির্দেশ, অভিভাবকের সম্মতি এবং বিধিতে বর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতি) পূরণ করে বিয়ে সম্পন্ন হয়, তবে সেই বিয়েটি এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

কেন এই আইনগুলো জাভা ড্রফরি?

রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই আইনগুলো অমান্য করলে আপনি কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে পারেন। কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, শরিয়ত সাবালকত্বের মানদণ্ড হিসেবে বয়স অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। শরিয়ত যেখানে পাপাচার থেকে বাঁচতে বাল্য হওয়ার পরপরই বিয়ের অনুমতি দেয়, রাষ্ট্র সেখানে বয়সের দোহাই দিয়ে কঠোর বাধা সৃষ্টি করছে।

এই বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখব, কীভাবে আধুনিক আইনের এই কড়াকড়ি অনেক সময় সামাজিক পাপাচার বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং কেন বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম করাচি এই আধুনিক বিলগুলোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী শরিয় ফতোয়া প্রদান করেছে। পাঠক যেন আল্লাহর দেওয়া শাস্ত্রত বিধান এবং মানুষের তৈরি আইনের এই পার্থক্য অনুধাবন করে নিজের ঈমান ও আমল রক্ষা করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই পথচলা।



জামিয়া দারুল উলুম করাচি: ঐতিহ্যের শেকড় ও পথচলা

(হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ রফি উসমানি রহ.-এর নিবন্ধের সংক্ষেপিত রূপ)

ঐতিহাসিক পটভূমি: ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে ধারণ করে উপমহাদেশে দ্বিনি ইলম ও মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষায় আকাবিরে দেওবন্দ যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, জামিয়া দারুল উলুম করাচি সেই সোনালি সিলসিলারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য: পাকিস্তান সৃষ্টির পর ফকিহুল উম্মত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) অনুভব করেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রে কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ শিক্ষার পাশাপাশি নাস্তিক্যবাদমুক্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র থাকা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যেই তিনি করাচিতে একটি বিশ্বমানের 'দারুল উলুম' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

যাত্রার সূচনা:

- প্রতিষ্ঠা: শাওয়াল ১৩৭০ হিজরি / জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।
- প্রথম অবস্থান: করাচির নানকওয়াড়া মহল্লার একটি পুরনো স্কুল ভবন।
- সূচনা: মাত্র দুইজন শিক্ষক ও গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে।

ক্যাম্পাস স্থানান্তর: ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী হাজি ইবরাহিম দাদাতাভাই ৫৬ একর জমি ওয়াকফ করেন। পরবর্তীতে ১৭ মার্চ ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি তার বর্তমান ক্যাম্পাস কোরাসি-তে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমান অনন্যতা: বর্তমানে এটি কেবল পাকিস্তান নয়, বরং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইলমি মারকাজ। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখান থেকে তৈরি হওয়া হাজার হাজার আলেম ও গবেষক আজ বিশ্বজুড়ে দ্বিনের খিদমত আগ্রাম দিচ্ছেন।

সাবালকত্বের বয়সসীমা ও উল্লু আমরের
আনুগত্যের শরয়ি বিধান



দারুল ইফতা, দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান।

বিষয়: শিশু বিবাহ নিরোধ বিল ২০২৫ (ইসলামাবাদ ক্যাপিটাল টেরিটরি চাইল্ড
ম্যারেজ রেস্ট্রিক্টেড বিল ২০২৫)
তারিখ: ২৭ এপ্রিল ২০২৬ / ৯ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি

— উত্তর —

(১) সাবালক হওয়ার বয়স ও লক্ষণসমূহ:

শরয়ি বিধান অনুযায়ী, ছেলেদের সাবালক বা বালেগ হওয়ার সম্ভাব্য সর্বনিম্ন বয়স ১২ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯ বছর। তবে এই বয়সে পৌঁছালেই কেউ বালেগ হয়ে যায় না; বরং এটি নির্ভর করে শরীরে শারীরিক লক্ষণ প্রকাশের ওপর। ছেলেদের ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার প্রধান চিহ্ন হলো বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ। মেয়েদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো—মাসিক (হায়েজ), স্বপ্নদোষ অথবা গর্ভধারণ। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শরীরের এমন কোনো লক্ষণ দেখা না দেয়, তবে অধিকাংশ আলেম বা জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ১৫ বছর পূর্ণ হলে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই 'বালেগ' হিসেবে গণ্য করা হবে। (বিস্তারিত দেখুন: আরবী ইবারত নং ৩ ও ৪)

(২) বিয়ের বয়স ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামে বিয়ের জন্য বয়সের এমন কোনো কঠোর বা নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি যে, তার আগে বিয়ে করা অবৈধ বা নাজায়েজ। বরং বিষয়টি ছেলে-মেয়ের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, কল্যাণ এবং তাদের অভিভাবকদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি অভিভাবকরা প্রয়োজন ও উপযোগিতা মনে করেন, তবে বিয়ে হতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, বাল্যে হওয়ার আগে সাধারণত বিয়ে দেওয়াকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়নি। এছাড়া বিয়ের আগে সন্তানদের দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য, এর ধর্মীয় বিধান এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া জরুরি; যাতে তারা মানসিক ও বাস্তবিকভাবে একটি সংসার পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। (বিস্তারিত দেখুন: আরবী ইবারত নং ১ ও ২)

প্রশ্ন: সরকার কি তার বিশেষ ক্ষমতার মাধ্যমে ১৮ বছরের আগে বিয়ে নিষিদ্ধ করতে পারে?

উত্তরঃ

(ক) ধর্মীয় ও সামাজিক বাস্তবতা:

বিবাহ ইসলামে কেবল একটি সাধারণ বৈধ কাজ (মুবাহ) নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ও ইবাদত। বিশেষত তীব্র যৌন তাড়নার মুহূর্তে নিজেকে পাপাচার থেকে বাঁচাতে বিয়ে করা ওয়াজিব (আবশ্যিক) হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার অবাধ ব্যবহারের ফলে নৈতিক অবক্ষয় বেড়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন প্রবণতা জাগ্রত হতে দেখা যায়। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে বিয়ের জন্য আরও ৪-৬ বছর অপেক্ষা করতে বাধ্য করা তাদের চারিত্রিক বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল। তাই ১৮ বছরের আগে বিয়েতে ঢালাও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া একটি সুন্নত বা ওয়াজিব কাজে বাধা দেওয়ার নামান্তর, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়।



(খ) রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার ও জনকল্যাণ:

ইসলামি আইন অনুযায়ী, সরকার কোনো বৈধ বিষয়ে তখনই বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে, যখন তাতে জনগণের নিশ্চিত কল্যাণ নিহিত থাকে। অথচ ১৮ বছরের আগে বিয়ে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার ফলে সমাজে নানা ধরনের অনৈতিকতা ও অনিষ্টের পথ খুলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। যেহেতু এই নিষেধাজ্ঞা জনকল্যাণের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাই শরিয়তের বিধান মতে সরকারের এ ধরনের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারির অধিকার নেই। (বিস্তারিত দেখুন: আরবী ইবারত নং ৫ থেকে ৭)

(৩) বিলের অসংগতি ও এর বিরূপ প্রভাব:

আলোচ্য বিলে (Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025) পাকিস্তান সরকার সাবালকত্ব বা বালেগ হওয়াকে ১৮ বছরের বয়ঃসীমার সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে, যা শরিয়ি বিধানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

এই বিলের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই ১৮ বছরের আগে বিয়ে করার ওপর ঢালাও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও এবং তারা শরিয়ি দৃষ্টিতে বালেগ হওয়া সত্ত্বেও, ১৮ বছরের নিচে যে কোনো বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

দণ্ডবিধি ও এর ভয়াবহতা:

বিষয়টি কেবল নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং ১৮ বছরের আগে বিয়ের পর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা বা সহবাসকেও ‘শিশু নির্যাতন’ (Child Abuse) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ছেলে-মেয়ের মা-বাবা, অভিভাবক, নিকাহ পরিচালনাকারী (কাজি) এবং বিবাহ নিবন্ধনকারী—সবার জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

• যৌক্তিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ:

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়: যদি কোনো তরুণ-তরুণীর ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং উভয় পক্ষ ও তাদের অভিভাবকরা তাতে সম্মত থাকেন; এমনকি পরিস্থিতি এমন হয় যে, বিয়ে না দিলে তারা পাপাচারের দিকে ধাবিত হবে এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবিক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে—তবুও এই আইন অনুযায়ী তাদের বিয়ের কোনো সুযোগ নেই!

এই আইনটি যেমন শরিয়ত বিরোধী, তেমনি এটি সুস্থ বিবেকেরও পরিপন্থী এবং একটি চরম ভুল পদক্ষেপ।

কর্তৃপক্ষের করণীয়:

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো—আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা ও ইস্তেগফার করা, জনস্বার্থ ও শরিয়ত বিরোধী এই বিলটি অনতিবিলম্বে বাতিল করা এবং ভবিষ্যতে ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী কোনো আইন পাস না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা।



মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.): জীবন ও কর্ম

জন্ম ও শিক্ষা:

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফকিহ মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) ১৮৯৭ সালে ভারতের দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কান্দাহারী (রহ.) এবং মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.)।

কর্মজীবন ও খিদমত:

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি দেওবন্দেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং দীর্ঘ ২৬ বছর সেখানে হাদিস, তাফসির ও ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠদান করেন। পরবর্তীতে তিনি দেওবন্দের 'প্রধান মুফতি' (মুফতিয়ে আজম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং সেখানে করাচিতে 'দারুল উলুম করাচি' প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়।

পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা:

তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে এবং একে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে 'উলামা কমিটির' সদস্য হিসেবে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

উল্লেখযোগ্য রচনা:

তিনি প্রায় শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কালজয়ী কাজ হলো কুরআনের তাফসির 'মাআরিফুল কুরআন'। এছাড়া ফতোয়া বিষয়ক গ্রন্থ 'ইমদাদুল মুফতিন', 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' এবং খতমে নবুওয়াত রক্ষায় তাঁর রচনাবলি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

জীবনাবসান:

এই মহান মনীষী ১৯৭৬ সালে করাচিতে ইন্তেকাল করেন। ইসলামের জ্ঞানতান্ত্রিক সেবা এবং মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।



মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানি (রহ.)-এর বক্তব্য

১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ১২ নম্বর ধারায় (১৯২৯ সালের 'চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুযায়ী) ছেলের বয়স ১৮ এবং মেয়ের বয়স ১৬ নির্ধারণ করে এর নিচে বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিল। ওই অধ্যাদেশ প্রসঙ্গে মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানি (রহ.) বলেন:

সচেতনতা বনাম আইনি নিষেধাজ্ঞা:

অল্প বয়সে বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব ত্রুটি বা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর কারণে একে উৎসাহিত না করাটাই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে আইন করে চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে সামাজিক সচেতনতা বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। কিন্তু আইনের দোহাই দিয়ে কোরআন ও সুন্নাহর বিধানের বিরোধিতা করা এবং আল্লাহর দেওয়া 'হালাল'কে 'হারাম' করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ:

পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে মেয়ের বিয়ের বয়স যে ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল—বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বলে যে, মেয়েরা সাধারণত ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই বালগ বা সাবালিকা হয়ে যায়। বালগ হওয়ার পর ২-৩ বছর পর্যন্ত আইনভাবে তাদের বিয়ে আটকে রাখা অনেক সময় তাদের অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; অথচ পাপাচার রোধে আমাদের প্রচলিত আইনে কোনো কার্যকর বিধান নেই।

একটি বিচারবিভাগীয় বৈপরীত্য:

এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একজন মুসলিম যুবক বা যুবতী যদি ব্যভিচারে (জেনা) লিপ্ত হয়, তবে প্রচলিত আইনে তার জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই। অথচ তারা যদি পবিত্র বন্ধন অর্থাৎ বিয়েতে আবদ্ধ হতে চায়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাস্তির খড়গ নেমে আসে!

অভিভাবকদের অসহায়ত্ব:

কখনো কখনো এমন হয় যে, সন্তানের অভিভাবকরা তাদের মধ্যে চারিত্রিক কোনো বিচ্যুতি বা নৈতিক দুর্বলতা অনুভব করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাদের বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই কঠোর আইনের কারণে তাদের পক্ষে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সন্তানদের পাপাচারের দিকেই ঠেলে দেয়। (সূত্র: জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৪/২৬৫)

বিশেষ দৃষ্টব্য:

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, আলোচ্য বিলটি শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অল্প বয়সে বিয়ের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে কিছু বাস্তব সমস্যা বা ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন:

- ক. বালেগ হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক স্বভাব বা রুচির মিল না হওয়া।
- খ. বৈবাহিক অধিকার ও পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকা।
- গ. অভিভাবকরা অনেক সময় তাদের 'বিলায়াত' বা অভিভাবকত্বের অধিকারের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থে নাবালকদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া।
- ঘ. অনেক ক্ষেত্রে জাগতিক স্বার্থ হাসিল বা পারিবারিক বিবাদ মেটানোর হাতিয়ার হিসেবে নাবালক ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার করা।

সারসংক্ষেপ:

এসব সম্ভাব্য অসুবিধার কারণেই ইসলাম বালেগ হওয়ার আগে বিয়ে দেওয়াকে ঢালাওভাবে উৎসাহিত বা প্রমোট করে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যেখানে 'ওলি' বা অভিভাবককে নাবালকের বিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে যাতে কোনো অনিষ্ট না ঘটে বরং বালেগ হওয়া পর্যন্ত তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়—সে ব্যাপারে শরিয়ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে।



এসব ত্রুটি দূর করতে এবং কম বয়সে বিয়ের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত শরিয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত:

১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা ও নৈতিকতাকে (তারবিয়াত) অগ্রাধিকার দিন:

কেবল কঠোর আইন প্রণয়ন করে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; বরং সমাজের শিক্ষা ও নৈতিক মানোন্নয়নে রাষ্ট্রকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ওপর জোর দিতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এমন সচেতনতা তৈরি হবে যে, তারা নিজেরাই সেসব ত্রুটি রোধ করতে পারবে, যেগুলো দূর করার জন্য এখন আইনের প্রয়োজন বোধ করা হচ্ছে।

২. আইন প্রণয়নের ভিত্তি হোক কুরআন ও সুন্নাহ:

যেকোনো রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মূল ভিত্তি হতে হবে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি শরিয়ত। পশ্চিমা সংস্কৃতি বা তাদের গবেষণার অন্ধ অনুকরণে মুসলিম সমাজের ওপর কোনো আইন চাপিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়।

৩. শরিয়তসম্মত উপায়ে সমাধান খুঁজুন:

অল্প বয়সে বিয়ের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো এমন পদ্ধতিতে সমাধান করতে হবে, যাতে শরিয়তের কোনো অকাট্য বিধানের পরিবর্তন বা লঙ্ঘন করতে না হয়। বিধানের মূল কাঠামো ঠিক রেখেই সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. গুনাহের পথ উন্মুক্ত করবেন না:

গুটিকয়েক ত্রুটি বা অনিষ্ট রোধ করতে গিয়ে যেন সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য পাপাচার ও অনৈতিকতার দুয়ার খুলে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, একটি ছোট সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যেন আরও বড় কোনো সামাজিক বিপর্যয় তৈরি না হয়।

উপসংহার:

সুতরাং, কর্তৃপক্ষ যদি সত্যিই অল্প বয়সে বিয়ের সমস্যাগুলো সমাধানে আন্তরিক হয়, তবে নির্ভরযোগ্য আলেমদের পরামর্শ নিয়ে শরিয়ত সমর্থিত এবং যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। শরিয়ত নির্ধারিত অধিকারে ঢালাওভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়।



যদি কোনো অভিভাবক নিজের স্বার্থে নাবালককে বিয়ে দেন, তবে তিনি মারাত্মক গুনাহগার হবেন। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের বিয়ে (স্বার্থের সংঘাত থাকলে) শরিয়তাবে কার্যকরই হয় না। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়েটি সম্পন্ন হলেও, ওই সন্তান বালেগ হওয়ার পরপরই 'খিয়ারে বুলুগ' (সাবালক হওয়ার পর বিয়ে রাখা বা না রাখার অধিকার) প্রয়োগ করে তা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার লাভ করে।

(৬) আইনের বিপরীতে সংঘটিত বিয়ের বৈধতা:

যদি বিয়ের যাবতীয় শরিয় শর্ত (যেমন: ইজাব-কবুল, সাক্ষী এবং অভিভাবকের সম্মতি) সঠিকভাবে পূরণ হয়, তবে প্রচলিত আইনের বিপরীতে গিয়ে বিয়ে সংঘটিত হলেও তা শরিয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় আইনে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হলেও ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী সেই দাম্পত্য সম্পর্ক বৈধ থাকবে।

(৭) বিবাহ পরিচালনাকারীর (কাজি) এখতিয়ার:

যিনি বিয়ে পড়বেন (কাজি বা নিকাহ রেজিস্ট্রার), তার পূর্ণ ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে। কোনো বিয়ের ক্ষেত্রে শরিয় বা পারিপার্শ্বিক কোনো জটিলতা মনে হলে তিনি চাইলে সেই বিয়ে পড়াতে পারেন, আবার চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও তিনি রাখেন।

এখানে ফতোয়ার মূল অংশের অনুবাদ সমাপ্ত হলো।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় আমরা এই ফতোয়ার সমর্থনে কুরআন, সুন্নাহ এবং নির্ভরযোগ্য ফিকহি কিতাবসমূহ থেকে সংগৃহীত আরবি দলিল ও তার বাংলা অনুবাদ সংযোজন করছি।



একটি বিশেষ নিবেদন:

এই দলিলসমূহ মূলত 'আহলুল ইলম' বা বিজ্ঞ আলেমদের জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে এবং এই যুগোপযোগী ফতোয়াটির দালিলিক গুরুত্ব ও গভীরতা অনুধাবন করার জন্য প্রতিটি আরবির সাথে প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ যুক্ত করে দেওয়া হলো। এর মাধ্যমে পাঠক সমাজ অনুধাবন করতে পারবেন যে, বর্তমান সময়ের এই জটিল মাসয়ালাটি কতটুকু অকাট্য এবং শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।



الأدلة الشرعية

١. الفُرْآنُ الْكَرِيمُ (سُورَةُ النِّسَاءِ)

{وَأِنْ جُمِعْتَ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَقْدُورًا وَتِلْكَ أَوَّلُ مَا جَاءَ فِي زُجْرَةِ النِّسَاءِ. آية: ٣}

٢. أُنْكَاحُ الْفُزَارِ لِلْجُصَاوِ (١٩-١٤)

بَابُ تَرْبِيَةِ الصَّغَارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأِنْ جُمِعْتَ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَقْدُورًا وَتِلْكَ أَوَّلُ مَا جَاءَ فِي زُجْرَةِ النِّسَاءِ. آية: ٣} وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ أَنْ يَنْكُحَهَا بِأَدْنَى مِنْ صَدَاقِهَا، فَهِيَ أَلَّا يَنْكُحُوهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَأَمَرُوا أَنْ يَنْكُحُوا سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ أَنْ يَلْبَسَ تَرْبِيَةَ الْيَتَامَى الصَّغِيرَةِ مِنْ خِثِّ دَلَّتْ عَلَى جِوَارِ تَرْبِيَةِ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ، إِذْ كَانَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَوْلِيَاءِ، وَلَا تَعْلَمُ فِي جِوَارِ ذَلِكَ جَلَامًا بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ مِنْ مَقْصَدِ الْأَمْرِ إِلَّا شَيْئًا رَوَاهُ بَشَرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ابْنِ سُبْرَةَ أَنَّ تَرْبِيَةَ الْأَبَاءِ عَلَى الصَّغَارِ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَصْحَفِ. وَيَذَلُّ عَلَى بَطْلَانِ هَذَا الْمَذْهَبِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ دَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّذِينَ يُتَيْمَنُ مِنْ الْمَجِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَعْتُمْ فَعُدَّتْكُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا} [الطلاق: ٤] فَحُكْمُ بِصَدَقَةِ طَلَاكِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحْضُرْ، وَالطَّلَاقُ لَا يَبْقَى إِلَّا فِي كِتَابٍ صَحِيحٍ، فَتَضَعُ الْآيَةُ جِوَارَ تَرْبِيَةِ الصَّغِيرَةِ. وَيَذَلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْبِيَةَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سَبِينٍ، رَوَاهُ إِهَابُ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. بَابُ دَفْعِ الْمَالِ إِلَى التَّيَمِّمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاتَّبَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} قَالَ الْخَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: "يُعْطَى اخْتِيارُهُمْ فِي غُلُوبِهِمْ وَجِدْيِهِمْ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَرْنَا بِاخْتِيارِهِمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَأَنَّهُ قَالَ: {وَاتَّبَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} فَأَخْبَرْنَا أَنَّ بُلُوغَ النِّكَاحِ بَعْدَ الْإِتِّبَالِ، لِأَنَّ حَتَّى غَايَةُ مَذْكُورَةٌ بَعْدَ الْإِتِّبَالِ.

(٣) (صحيح مسلم مع شرحه تكملة فتح الملهم (٣/٣١١-٣١٢))

كَذَلِكَ فَحَدَّثَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُفَيْرٍ. كَذَلِكَ أَبِي. كَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ ابْنِ عُمرٍ. قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يَجْزِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ. وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأُجَازَنِي.. قَالَ نَافِعٌ: فَجَعَلَتْ عَلَى عُمرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثُ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكُتِبَ إِلَى غُلَامِهِ أَنْ يَفْرُسُوا لَهُمْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. وَمَنْ كَانَ ذُوْنِ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِبَالِ... مَسْأَلَةُ سَبِّ الْبُلُوغِ قَوْلُهُ: {إِنْ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ} بِهِ اسْتِدْلَالٌ مِنْ جَعْلِ سَبِّ الْبُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ جَمِيعًا. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو يُوسُفَ. وَحُجْمٌ رَجَعَهُمُ اللَّهُ. كَمَا فِي الْمُهَنْدِي لِابْنِ قُدَامَةَ (٤: ٥١٤). وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ. وَأَصْبَغُ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَاجِشُونٍ. وَعُمرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ. كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْفَرُطِيِّ (٥: ٣٥). وَهُوَ الْمُفْتَنُ بِهِ عِنْدَ الْمَشَائِخِ الْحَنْفِيَّةِ. وَقَالَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ: لَا حَدٌّ لِلْبُلُوغِ مِنَ السَّنِّ. وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الرَّجُلُ بَالِغًا عِنْدَهُ حَتَّى يَنْزِلَ أَوْ يَخْبَلَ بِأَلْفٍ مَا بَلَغَ مِنَ السَّنِّ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ أَصْحَابُهُ: سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً. وَقِيلَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. وَفِي الْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ. كَمَا فِي كِتَابِ الْحَجَرِ مِنَ الْجَدَايَةِ مَعَ الْفَتْحِ (٦: ٢٠١). وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ. فَإِنْ ظَهَرَتْ فَلَا عَيْرَةَ بِالسَّنِّ بِالْإِجْمَاعِ. وَأَمَارَاتُ الْبُلُوغِ مِنْهَا مَا أَتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ. وَهُوَ الْإِنْزَالُ أَوْ الْإِخْبَالُ فِي الْغُلَامِ. وَالْحِضُّ فِي الْجَارِيَةِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّنِ: «وَأَمَرُوا عَلَى أَنَّ الْفَرَايِضَ وَالْأَحْكَامَ تُجِبُّ عَلَى الْخُتْلَعِ الْعَاقِلِ. وَعَلَى الْمَرْأَةِ بِظُهُورِ الْخُضِّ مِنْهَا» كَمَا فِي الْمُهَنْدِي.. وَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُقَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [سورة النور. آية: ٥٩] وَالْخُلُقُ: الْإِخْلَاقُ. وَهُوَ لَفْظٌ مَا يَرَاهُ النَّاسُ. وَالْمَرْأَةُ بِهَا خُرُوجُ الْمَدِي فِي نَوْمٍ أَوْ يَنْقُطُ بِجَمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [سورة النساء. آية: ٦] فَإِنَّ بُلُوغَ النِّكَاحِ كِتَابِيٌّ عَنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ. وَهِيَ بِالْإِنْزَالِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْتَعِ بَعْدَ إِخْلَاقٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الصُّوَالِ (رقم: ٢٨٥٣). وَسُكِّنَ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ الْعَزِيزِيُّ فِي السَّرَاحِ الْمُبِيرِ (٤: ٤٣٠) أَنَّ إِسْتِذَاذَهُ حَسَنٌ... وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمِنْ كُلِّ حَالٍ جِبَارًا» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الزَّكَاةِ. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرَةِ. (رقم: ٢١٩). وَأَبُو دَاوُدَ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ. (رقم: ١٥٧٦). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَيْغُ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثٍ» وَهِيَ: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِعَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالْخَالِكِيُّ عَنْ عَلِيِّ وَعُمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (٤: ١٦١). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِحِمَارٍ» وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ خُرَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ. كَمَا فِي نَبْلِ الْأَوْطَارِ (٢: ٧١). وَلَفْظُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (رقم: ٣٨٥٥): «لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِحِمَارٍ».

E. الذَّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ رَكِّ الْمُخْتَارِ (١٠٣-١٠٤)

فصل. (تأويل الغلام بالإختلاج والإخبال والإيزال) والأصل هو الإيزال (والجارية بالإختلاج والحيض والخبل) ولَمَّ يَذْكُرُ الْإِنِّالَ صَريحا لأنَّهُ قُلَّمَا يَغْلَمُ مِثْلُهَا (فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ فِيهِمَا) شَيْءٌ (فَحَتَّى يَبْعَ لِكُلِّ مِثْلِهَا خُمُسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِهْ يُقْتَدَى) لِقِصْرِ أَعْمَارِ أَهْلِ زَمَانِنَا. (وَأَدْنَى مَدَّتِهِ لِلْغُلَامِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً. وَالْجَارِيَةُ تَبْعُ سِتِينَ) هُوَ الْمُخْتَارُ، كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَأَحْكَامِ الصَّغَارِ. (قَوْلُهُ: بِهْ يُقْتَدَى) هَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ وَبِهِ قَالَتْ الْأَيْمَةُ الثَّلَاثَةُ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ حَتَّى يَبْعَ لَهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً وَلَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً. (قَوْلُهُ: لِقِصْرِ أَعْمَارِ أَهْلِ زَمَانِنَا) وَلَئِنْ «إِنَّ عَمْرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - غَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَسِتُّهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَرَسَةً، ثُمَّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَسِتُّهُ خُمُسَةُ عَشَرَ فَقِيلَ» وَلَئِنَّهَا الْعَادَةُ الْغَالِيَةُ عَلَى أَهْلِ زَمَانِنَا. وَغَيْرُهُمَا اخْتِيَاظَ فَلَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْعَادَةِ إِحْدَى الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ نَصٌّ عَلَيْهِ الشُّمُوءُ وَغَيْرُهُ دَرْ مُتَّقَى

II. صَحيح مُسْتَعْلَمٌ مَعَ شَرْحِهِ تَكْوِيلُهُ فَتَحِ الْمُنْهَجُ (٢٦٩-٢٦٨)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ ارْتَدَوْا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا

وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ قَوْلُهُ: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) قَدْ ثَبَتَ بِأَحَادِيثِ النَّبِائِ مُبْدِئَانِ عَظِيمَانِ مِنَ مَبَادِي السِّيَاسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اسْتَعْمَلَهَا الشُّعْهَاءُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ: الْأَوَّلُ: مُبْدَأُ طَاعَةِ الْأَمِيرِ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ يُجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطِيعَ أَمِيرَهُ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ، فَإِنْ أَمَرَ الْأَمِيرُ بِفَعْلٍ مَبَاحٍ، وَجِبَتْ مُبَاشَرَتُهُ، وَإِنْ نَهَى عَنْ أَمْرٍ مَبَاحٍ، خَرَجَ إِنْكَارُهُ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [سُورَةُ النَّسَاءِ: آيَةُ: ٥٩] فَلَوْ كَانَ الْمَرْأَدُ مِنْ إِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ إِطَاعَتُهُمْ فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَحَسْبُ، لَمَا كَانَ هُنَاكَ دَاعٍ لِاسْتِقْلَالِهِمْ بِالذِّكْرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّ إِطَاعَتَهُمْ فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسَتْ إِطَاعَةً لِأُولِي الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَلَمَّا أَمْرَدَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، بِالذِّكْرِ ظَهَرَ أَنَّ الْمَرْأَدَ إِطَاعَتُهُمْ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ. .. وَمِنْ هُنَا صَرَّحَ الشُّعْهَاءُ بِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَاجِبَةٍ، قَالَ أَبُو عَالِيٍّ فِي بَابِ الِاسْتِشْقَاءِ مِنْ رَكِّ الْمُخْتَارِ (١: ١٧٢): إِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِالصِّيَامِ فِي غَيْرِ الْأَيَّامِ الْمُنْهَجِيَّةِ وَجِبَ، لِمَا قَدَّمَاهُ فِي بَابِ الْعِيدَيْنِ مِنْ أَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَاجِبَةٍ. وَحَذَى اثْنَةُ الْعَلَامَةِ عَلَاءُ الدِّينِ عَنْ الْبَيْهَقِيِّ: إِنَّ الْحَاكِمَ لَوْ أَمَرَ أَهْلَ بِلَدَةٍ بِصِيَامِ أَيَّامٍ بِسَبَبِ الْغَلَاءِ أَوْ الْوَبَاءِ وَجِبَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ، رَاجِعٌ لَهُ قَرَّةٌ غَيُوبِ الْأَخْيَارِ (٢: ١٠٤)

1. رَكُّ الْمُخْتَارِ عَلَى الذَّرِّ الْمُخْتَارِ (١٧٢-١٧٠)

مُطْلَبٌ تُجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ. قَالَ فِي الظَّهْرِيَّةِ: وَهُوَ تَأْوِيلٌ مَا رَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفَدَّحَدَّ فَإِنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ لِأَنَّ هَارُونَ أَمْرَهُمَا أَنْ يَكْبُرَا بِتَكْبِيرٍ جَدُّهُ فَعَمَلَا ذَلِكَ امْتِثَالًا لَهُ لَا مَذْهَبًا وَاعْتِقَادًا قَالَ فِي الْمَوْعِزِ أَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَاجِبَةٍ أَهـ وَهَنُفْ مِنْ جَزْمٍ بِأَنَّ ذَلِكَ رَوَايَةٌ عَنْهُمَا بَلْ فِي الْمَجْتَمَعِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى هَذَا ثُمَّ ذَكَرَ غَيْرَ وَاجِدٍ مِنَ الْمُشَايِخِ أَنَّ الْمُخْتَارَ الْعَمَلُ بِرَوَايَةِ الزِّيَادَةِ أَيْ زِيَادَةُ تَكْبِيرَةِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَبِرَوَايَةِ التَّقْضَانِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى عَمَلًا بِالرَّوَايَتَيْنِ وَتَخْفِيفًا فِي عِيدِ الْأَضْحَى لِإِشْغَالِ النَّاسِ بِالْأَضَاجِي... [تَنْبِيْهُ] إِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِالصِّيَامِ فِي غَيْرِ الْأَيَّامِ الْمُنْهَجِيَّةِ وَجِبَ لِمَا قَدَّمَاهُ فِي بَابِ الْعِيدِ مِنْ أَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَاجِبَةٍ..

II. كِتَابُ الْأَشْبَاهِ وَالنِّظَارِ لِابْنِ نُجَيْمٍ (ص: ١-٢-١٧٢)

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمُضْلَخَةِ. وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ... تَنْبِيْهُ: إِذَا كَانَ فَعْلُ الْإِمَامِ مُبْتَدَأً عَلَى الْمُضْلَخَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَاقَةِ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخُرَاجِ مِنْ بَابِ إِخْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ. وَقَالَ قَاضِي خَانٍ فِي مَقَالَتِهِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ: وَلَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَذِنَ لِقَوْمٍ أَنْ يَجْعَلُوا أَرْضًا مِنْ أَرْضِي الْبِلْدَةِ خَوَانِيَّةً مُؤَوَّفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ أَمْرَهُمْ أَنْ يَبْنِيُوهُ فِي مَسْجِدِهِ، إِنْ كَانَتْ الْبِلْدَةُ مُنْتَحَتٌ عَنْوَةً، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْمَاءِ وَالنَّاسِ، يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا. وَإِنْ كَانَتْ الْبِلْدَةُ مُنْتَحَتٌ ضَلَحًا تَبْقَى عَلَى مَلِكٍ مَلَكَهَا، فَلَا يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا أَهـ.

واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ



শরয়ী দলিলসমূহ (অনূদিত)

১. কুরআনুল কারিম (সূরা নিসা)

আয়াত-১:

[النساء: ৩] {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنَاتِ فَاذْكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَزَوَاجٍ
"আর তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে (অন্য) নারীদের মধ্যে যাদের
তোমাদের ভালো লাগে, তাদের বিয়ে করো—দুই, তিন অথবা চারটি পর্যন্ত।"

আয়াত-২:

[النساء: ৬] {وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِلَّا يَتَأْتُوا النِّكَاحَ} "আর এতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছায়।"

২) আহকামুল কুরআন লিল-জাম্বাস (২/৬৪-৬৯)

পরিচ্ছেদ: অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ দান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

"আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতিমদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তবে (অন্য) নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমতো দুই, তিন অথবা চারজনকে বিয়ে করো।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩)

আয়াতের প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা:

ইমাম যুহরী (রহ.) উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আয়েশা (রা.)-কে আল্লাহর বাণী— "আর যদি তোমরা ভয় করো যে এতিমদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না"—এই আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি উত্তরে বললেন: "হে আমার ভাগ্নে! এই আয়াতে এমন এতিম মেয়ের কথা বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে। অভিভাবক যদি তার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় এবং প্রচলিত মোহরের চেয়ে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে তাদের (অভিভাবকদের) এমন মেয়েদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে—যতক্ষণ না তারা তাদের প্রতি পূর্ণ সুবিচার (অর্থাৎ ন্যায্য মোহর প্রদান) করে। এর পরিবর্তে তাদের অন্য নারীদের মধ্য থেকে বিয়ে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

"পবিত্র কুরআনের এই আয়াত (সূরা নিসা: ৩) এ কথারও প্রমাণ দেয় যে, বাবার জন্য তার নাবালিকা বা ছোট মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বৈধ। কারণ এই আয়াতটি সামগ্রিকভাবে অভিভাবকদের বিয়ে দেওয়ার বৈধতাকে তুলে ধরে, আর অভিভাবকদের মধ্যে বাবাই হলেন সবচেয়ে নিকটবর্তী ও প্রধান ব্যক্তি।

পূর্ববর্তী (সালফ) এবং পরবর্তী (খালফ) যুগের বিভিন্ন জনপদের ফকিহদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ আমাদের জানা নেই। তবে ইবনে শুবরুমাহ এবং আবু বকর আল-আসাস-এর মতে—অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে দেওয়া বাবার জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু তাদের এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি বাতিল হওয়ার পক্ষে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সুস্পষ্ট দলিল হিসেবে কাজ করে: 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুস্রাব হওয়ার আশা নেই, তাদের ইন্দ্রত সম্পর্কে যদি তোমরা সংশয়ে থাকো, তবে তাদের ইন্দ্রত হবে তিন মাস; আর তাদেরও (ইন্দ্রত তিন মাস) যাদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি।' (সূরা আত-ত্বালাক: ৪)

যৌক্তিক বিশ্লেষণ:

এখানে আল্লাহ তাআলা সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের তালাক কার্যকর হওয়ার বিধান দিয়েছেন, যার এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি (অর্থাৎ অল্প বয়সের কারণে)। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, তালাক কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন বিয়েটি আগে থেকে বৈধ (সহিহ) থাকে। সুতরাং, এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নাবালিকা বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহের বৈধতাকেই প্রমাণ করে।"



রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুমাহ থেকে প্রমাণ:

"অপ্রাপ্তবয়স্কঅবস্থায় বিবাহের বৈধতার ওপর আরও একটি বড় প্রমাণ হলো—নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। তাঁর পিতা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) স্বয়ং তাঁকে এই বিয়ে দিয়েছিলেন।"

কুরআনুল কারিমের ভাষ্য ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর তোমরা এতিমদের পরীক্ষা করো, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছায়। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির (পরিপক্কতার) আভাস পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর করো।" (সূরা আন-নিসা: ৬) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদাহ এবং সুদী (রহ.) বলেছেন: "অর্থাৎ, তাদের বিচার-বুদ্ধি (আকল) এবং দ্বীনদারির বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করো।"

ইমাম আবু বকর জাসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:

"এই আয়াতে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা এতিমদের সাবালক হওয়ার আগেই পরীক্ষা করি। কারণ আল্লাহ বলেছেন— 'এতিমদের পরীক্ষা করো যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছায়'। এখান থেকে বোঝা যায় যে, 'বিয়ের বয়সে পৌঁছানো' হলো পরীক্ষার পরবর্তী একটি ধাপ। কারণ আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এখানে 'حَتَّى' (পর্যন্ত) শব্দটি পরীক্ষার সময়সীমা বা শেষ সীমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।"

(৩) সহিহ মুসলিম মা শরিহি তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম (৩/৩১৭-৩১৮)

সাবালকদের বয়সসীমা নির্ধারণে হাদিসের প্রমাণ:

মুহাম্মাদ ইবনুল আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর (রা.) বলেন: "উহুদ যুদ্ধের দিন আমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যুদ্ধের জন্য পেশ করা হলে তিনি দেখলেন আমার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। কম বয়সের কারণে তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিলেন না। পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধের দিন আমাকে আবারও পেশ করা হলে আমার বয়স তখন ছিল পনেরো বছর; তখন তিনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন।"

প্রশাসনিক প্রয়োগ ও খলিফার সিদ্ধান্ত:

ইমাম নাফে' (রহ.) বলেন: "পরবর্তীতে আমি তৎকালীন খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই হাদিসটি শোনালুম। হাদিসটি শুনে তিনি বললেন— 'নিশ্চয়ই এটি (পনেরো বছর বয়স) ছোট এবং বড়র (নাবালগ ও সাবালগ) মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্যকারী সীমা।' এরপর তিনি তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের (গভর্নরদের) কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠালেন যে— যাদের বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়েছে, তাদের যেন সরকারি ভাতা ও যোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর যাদের বয়স এর নিচে, তাদের যেন শিশুদের (পরিবার-নির্ভরশীলদের) তালিকায় রাখা হয়।"

সাবালক হওয়ার বয়স সংক্রান্ত মাসআলা

সর্বসম্মত অভিমত ও দলিল:

খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর সেই বিখ্যাত উক্তি— "নিশ্চয়ই এটি (১৫ বছর) ছোট এবং বড়র মধ্যে একটি পার্থক্যকারী সীমা"—এর ওপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ আলেম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাবালক হওয়ার বয়স 'পনেরো বছর' নির্ধারণ করেছেন।

এই মত পোষণকারী ইমামগণ:

বিখ্যাত আলেম ইবনে কুদামা তাঁর 'আল-মুগনী' (৪:৫১৪) কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, পনেরো বছর বয়সের এই অভিমতটি নিম্নলিখিত ইমামদের: ইমাম আওযায়ী (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)। এছাড়া ইবনে ওয়াহাব, আসবাগ, আব্দুল মালিক ইবনে মাজিশুন, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং মদিনার একদল আলেমও একই মত পোষণ করেছেন। ইবনে আরাবীও এই মতটিকে পছন্দ করেছেন, যা 'তাকফীরে কুরতুবী' (৫:৩৫)-তে বর্ণিত হয়েছে।



হানাকী মাযহাবের সিদ্ধান্ত:

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হানাকী মাযহাবের পরবর্তী যুগের আলেমদের (মাশায়েখদের) নিকট বর্তমানে এই ‘পনেরো বছর’ বয়সই ফতোয়া প্রদানের জন্য চূড়ান্ত ও গৃহীত মত হিসেবে গণ্য।

সাবালক হওয়ার বয়স ও লক্ষণসমূহ (ভিন্ন মতসমূহ)

নির্দিষ্ট বয়সহীন মতবাদ:

দাউদ জাহেরী (রহ.)-এর মতে, সাবালক হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়সসীমা নেই। তাঁর অভিমত হলো—একজন পুরুষ যতক্ষণ না স্বপ্নদোষ (বীর্যপাত) বা গর্ভধারণের সক্ষমতা অর্জন করবে, ততক্ষণ তাকে সাবালক গণ্য করা যাবে না; তার বয়স যত বেশিই হোক না কেন। এটি ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি বিশেষ বর্ণনা। তবে মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম সাবালকত্বের বয়স হিসেবে ১৭ বা ১৮ বছরকে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর পূর্ণ হলে তাদের সাবালক হিসেবে গণ্য করা হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এটি ১৯ বছর পর্যন্তও উল্লেখ করা হয়েছে; যেমনটি হিদায়া গ্রন্থের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল কাদির’-এ (৮:২০১) বর্ণিত হয়েছে।

ঐক্যমত্য ও শারীরিক লক্ষণসমূহ

শারীরিক লক্ষণের অগ্রাধিকার:

সাবালকত্বের বয়সের এই সমস্ত হিসাব কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন শরীরে সাবালক হওয়ার কোনো বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যদি শারীরিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা অনুযায়ী) বয়সের হিসাবের আর কোনো গুরুত্ব থাকে না।

ফকিহগণ সাবালকত্বের যেসব লক্ষণের ওপর একমত হয়েছেন তা হলো: **ছেলেদের ক্ষেত্রে:** স্বপ্নদোষ হওয়া বা কাউকে গর্ভবতী করার সক্ষমতা অর্জন করা। **মেয়েদের ক্ষেত্রে:** ঋতুশ্রাব (হায়েজ) শুরু হওয়া। **ইবনে মুনির (রহ.) বলেন:** “আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হলে এবং নারীর ঋতুশ্রাব শুরু হলে তাদের ওপর শরিয়তের বিধিবিধান ও ফরজসমূহ অর্পিত হবে।” (আল-মুগনী)।

দলীলসমূহ

১. **কুরআনুল কারিম:** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন— “তোমাদের সন্তানরা যখন ‘হলুম’ (স্বপ্নদোষের বয়সে) পৌঁছাবে, তখন তারাও যেন (কক্ষে প্রবেশের জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করে।” (সূরা নূর: ৫৯)। এখানে ‘হলুম’ অর্থ স্বপ্নদোষ, যা মূলত ঘুমের ঘোরে বীর্যপাত হওয়াকে বোঝায়; তবে ব্যাপক অর্থে যেকোনো ভাবে বীর্য নির্গত হওয়াকেই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. **বিবাহের সক্ষমতা:** আল্লাহ তাআলা আরও বলেন— “যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছায়।” (সূরা নিসা: ৬)। এখানে ‘বিয়ের বয়স’ বলতে সহবাসের সক্ষমতা অর্জনকে বোঝানো হয়েছে, যা মূলত বীর্যপাতের মাধ্যমেই নিশ্চিত হয়।

৩. **সুন্নাহর প্রমাণ (এতিমত্বের অবসান):** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— “স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর কোনো এতিমত্ব থাকে না (অর্থাৎ সে সাবালক হয়ে যায়)।” (সুনানে আবু দাউদ)। আল-আজিজি এই হাদিসের সনদকে ‘হাসান’ বা উন্নত মানের হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪. **দায়িত্ব অর্পণ:** রাসূলুল্লাহ ﷺ মুজাজ (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন— “প্রত্যেক ‘হালিম’ (সাবালক ব্যক্তি) থেকে এক দীনার (জিজিয়া) গ্রহণ করবে।” (সুনানে তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

৫. **শরয়ি জবাবদিহিতা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন— “তিনি ব্যক্তি থেকে (হিসাবের) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; তাদের একজন হলো শিশু, যতক্ষণ না তার স্বপ্নদোষ হয়।” (আবু দাউদ ও আহমাদ)।

৬. **ইবাদতের আবশ্যকতা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— “ঋতুবতী হওয়ার বয়সে পৌঁছানো নারীর সালাত ওড়না (মাথা ঢাকা) ছাড়া আল্লাহ কবুল করেন না।” (সুনানে তিরমিযী)।



(৪) আদ-দুররুল মুখতার মা রুদ্দিল মুহতার (৬/১৫৩-১৫৪)

সাবালকহু নির্ধারণের মূল ভিত্তি:

বালকের সাবালকহু নির্ধারিত হয় স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত অথবা কাউকে গর্ভধারণে সক্ষম করার মাধ্যমে; যার মূল ভিত্তি হলো বীর্যপাত। অন্যদিকে, বালিকার সাবালকহু নির্ধারিত হয় স্বপ্নদোষ, ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণের মাধ্যমে। বালিকার ক্ষেত্রে বীর্যপাতের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কারণ এটি সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না।

বয়সের ভিত্তিতে ফতোয়া:

যদি উল্লিখিত শারীরিক লক্ষণগুলোর কোনটিই প্রকাশ না পায়, তবে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। বর্তমানে ‘পনেরো বছর’ পূর্ণ হওয়ার মতটির ওপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়। এর কারণ হলো—পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান মানুষের গড় আয়ু ও শারীরিক গঠন পরিবর্তিত হয়েছে।

ইমামদের অভিমত ও সমন্বয়:

‘পনেরো বছর’ পূর্ণ হওয়ার এই মতটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকেও এই মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া অপর তিন প্রধান ইমাম (শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ রহ.)-ও এই একই মত পোষণ করেছেন। যদিও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রধান মত অনুযায়ী এই বয়স সীমা ছিল ছেলেদের জন্য আঠারো এবং মেয়েদের জন্য সতেরো বছর।

যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও প্রচলিত প্রথা:

পনেরো বছর বয়সকে গ্রহণ করার পেছনে দলিল হলো—ইবনে উমর (রা.)-কে চৌদ্দ বছর বয়সে ওছদ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু পনেরো বছর বয়সে খন্দক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বর্তমান যুগের মানুষের শারীরিক বিকাশের সাধারণ রীতি বা অভ্যাসও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আঠারো বা সতেরো বছরের হিসাবটি ছিল মূলত ‘সতর্কতা’ হিসেবে। তাই পনেরো বছরের সাথে একে বিরোধপূর্ণ মনে করার কারণ নেই। যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয় সংখ্যাগত বিধান (নস) নেই, সেখানে মানুষের প্রচলিত অভ্যাস বা সামাজিক রীতি শরিয়তের অন্যতম দলিল হিসেবে গণ্য হয়—যা শুন্‌মুন্নি এবং ‘দুররে মুনতাকা’ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(দলিলের পরবর্তী অংশগুলো থেকে আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান (সরকার) এর আনুগত্যের সীমানা জানা যাবে)

(৫) সহিহ মুসলিম মা শরহিহি তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম (৩/২৬৭-২৬৮)

ঘটনার বিবরণ:

মুহাম্মাদ ইবনে জাফর (রহ.) আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার একটি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের ওপর একজনকে আমির (কমান্ডার) নিযুক্ত করেছিলেন। পথিমধ্যে সেই আমির কোনো কারণে রাগান্বিত হয়ে আগুন জ্বালান এবং সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন— “তোমরা এই আগুনে প্রবেশ করো।” তখন কিছু লোক আমিরের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য হয়ে তাতে প্রবেশ করতে চাইল। কিন্তু অন্যেরা বলল— “আমরা তো আগুন থেকেই রেহাই পেতে (জাহান্নাম থেকে বাঁচতে) ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাহলে এখন কেন আগুনে বাঁপ দেব?” পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিষয়টি জানানো হলে, যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল তাদের সম্পর্কে তিনি বললেন— “যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর সেখান থেকে বের হতে পারতে না (অর্থাৎ এটি আত্মহত্যার শামিল হতো)।” আর যারা প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের প্রশংসা করলেন এবং বললেন: “আল্লাহর নাবিরমানি বা আবাস্যতা হয় এমন কোনো কাজে মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য কেবল সাংকাজের (মা'রুফ) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।”



ইসলামি রাজনীতির দুটি মূলনীতি:

এই হাদিসগুলো থেকে ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের দুটি মহান মূলনীতি প্রমাণিত হয়, যা ফকিহগণ বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন:

১. আমিরের (নেতার) আনুগত্যের মূলনীতি:

একজন মুসলমানের ওপর তার আমিরের আনুগত্য করা 'মুবাহ' (শরিয়তে যা নিষিদ্ধ নয় এমন সাধারণ বিষয়) কাজগুলোতে ওয়াজিব বা আবশ্যিক। যদি আমির কোনো মুবাহ কাজ করার নির্দেশ দেন, তবে তা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। একইভাবে, তিনি যদি কোনো মুবাহ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তবে তা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর ভিত্তি হলো আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার বাণী: "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (নেতৃত্বের অধিকারী) তাদেরও।" (সূরা নিসা: ৫৯)।

উলুল আমরের স্বতন্ত্র আনুগত্যের যুক্তি:

যদি 'উলুল আমর' বা নেতৃত্বের আনুগত্য কেবল শরিয়ত নির্ধারিত ওয়াজিব কাজগুলো (যেমন: নামাজ, রোজা) পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তবে পবিত্র কুরআনের আয়াতে তাঁদের পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না। কারণ, শরিয়তের নির্ধারিত ফরজ বা ওয়াজিব কাজে তাঁদের আদেশ মানা মূলত আল্লাহরই আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আয়াতে তাঁদের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন, তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে—মুবাহ বা সাধারণ বিষয়গুলোতেও (যেখানে শরিয়তের সরাসরি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই) তাঁদের আনুগত্য করা আবশ্যিক।

ফকিহগণের সিদ্ধান্ত:

ফকিহগণ স্পষ্টভাবে একমত হয়েছেন যে, পাপাচার বা শরিয়ত বিরোধী নয় এমন সব বিষয়ে ইমাম বা শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লামা ইবনে আবিদীন 'রদুল মুহতার' গ্রন্থের ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা) অধ্যায়ে (১:৭৯২) এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইমাম যদি নিষিদ্ধ দিনগুলো (দুই ঈদ) বাদে অন্য কোনো দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দেন, তবে তা জনগণের ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে—পাপাচার নয় এমন সব বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব।"

প্রশাসনিক আদেশের ধর্মীয় গুরুত্ব:

তঁার পুত্র আল্লামা আলাউদ্দীন, আল-বায়েরি থেকে বর্ণনা করেছেন: "যদি কোনো বিচারক বা শাসক দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বা মহামারীর মতো সংকটকালে শহরের অধিবাসীদের নির্দিষ্ট কিছু দিন রোজা রাখার (বা অন্য কোনো নিয়ম পালনের) নির্দেশ দেন, তবে সেই আদেশ পালন করা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব।" (বিস্তারিত দেখুন: 'কুররাতু উয়ুনিল আখইয়ার' ২:৪৪)

(৬) রদুল মুহতার (২/১৭২-১৮৫)

আলোচ্য বিষয়: পাপাচার নয় এমন বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

'জাহিরিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আমলের একটি ব্যাখ্যা। তাঁরা (ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তকবিরের ক্ষেত্রে) এই আমলটি করেছিলেন কারণ খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁদেরকে তাঁর দাদার (ইবনে আব্বাস রা.-এর) পদ্ধতি অনুযায়ী তকবির দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা এটি মূলত খলিফার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যেই করেছিলেন, নিজস্ব মাযহাব বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে নয়। 'মিরাজ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—এর কারণ হলো, পাপাচার বা গুনাহ নয় এমন বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

ফকিহদের মধ্যে কেউ কেউ দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, এটি তাঁদের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। এমনকি 'মুজতবা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এই মতের দিকেই ফিরে এসেছিলেন। অতঃপর অনেক মাশায়েখ (বিদ্বান) উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে গ্রহণযোগ্য আমল হলো—ঈদুল ফিতরে তকবির বৃদ্ধির রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা এবং ঈদুল আযহায় তকবির কমানোর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা; যাতে উভয় রেওয়ায়েতের ওপরই আমল সম্পন্ন হয় এবং ঈদুল আযহায় মানুষের কোরবানির ব্যস্ততা থাকায় তকবির কমিয়ে বিষয়টি সহজ করা যায়।



[সতর্কীকরণ] ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক) যদি নিষিদ্ধ দিনগুলো (দুই ঈদ ও আইয়ামে তাশরিক) ব্যতীত অন্য সময়ে রোজা রাখার নির্দেশ দেন, তবে তা পালন করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে 'ঈদ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে —পাশাচর বা গুনাহ নয় এমন বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

(৭) কিতাব: আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর — ইবনে নুজাইম (পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৬)

পঞ্চম মূলনীতি: জনগণের ওপর ইমামের (শাসকের) সিদ্ধান্ত বা পরিচালনা জনকল্যাণের ওপর নির্ভরশীল।

ফকিহগণ বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো— 'কিতাবুস সুলহ' (সন্ধি অধ্যায়)–এ বর্ণিত সাধারণ চলাচলের রাস্তায় নির্মিত 'জুল্লা' বা ছাদ-সংবলিত বারান্দার বিষয়ে ইমামের পক্ষ থেকে সন্ধি বা আপস করার মাসআলাটি। এছাড়া ইমাম আবু ইউসুফ (রাহিমাছল্লাহ) তাঁর 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সতর্কীকরণ:

সাধারণ বিষয়বলির ক্ষেত্রে ইমামের (শাসকের) কর্মকাণ্ড যেহেতু জনকল্যাণের ওপর নির্ভরশীল, তাই তাঁর আদেশ শরিয়ত অনুযায়ী কার্যকর হবে না যদি না তা জনকল্যাণমুখী হয়। যদি তাঁর আদেশ জনকল্যাণের পরিপন্থী হয়, তবে তা কার্যকর হবে না। একারণেই ইমাম আবু ইউসুফ (রাহিমাছল্লাহ) তাঁর 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থের মৃত ভূমি আবাদকরণ (ইহইয়াউল মাওয়াত) অধ্যায়ে বলেছেন: "সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত কোনো অধিকার ব্যতীত কারও হাত থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো অধিকার ইমামের নেই।" (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

কাযী খান তাঁর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের ওয়াকফ অধ্যায়ে বলেছেন: "যদি কোনো সুলতান (শাসক) একদল লোককে শহরের কোনো একটি জমিতে মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত দোকান নির্মাণের অনুমতি দেন অথবা তাঁদেরকে তাঁদের মসজিদে জায়গা বৃদ্ধি করার আদেশ দেন; তবে ফকিহগণ বলেছেন: যদি শহরটি যুদ্ধজয়ের (আনওয়াতান) মাধ্যমে অধিকৃত হয়ে থাকে এবং (সেই নির্মাণকাজ) পথচারী ও সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি না করে, তবেই সেখানে সুলতানের আদেশ কার্যকর হবে। আর যদি শহরটি সন্ধির (সুলহান) মাধ্যমে অধিকৃত হয়ে থাকে, তবে তা (পূর্বের) মালিকদের মালিকানাতেই থাকবে। ফলে সেখানে সুলতানের আদেশ কার্যকর হবে না।" (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

পরিমার্জিত রূপ:

জামিয়া দারুল উলুম করাচি-এর দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত এই ফতোয়াটির সত্যতা ও দালিলিক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞ মুফতিগণের স্বাক্ষর ও সিলমোহর বিদ্যমান রয়েছে।

ফতোয়া প্রদানকারী:

মুফতি আব্দুল্লাহ ওলী(দারুল ইফতা, জামিয়া দারুল উলুম করাচি)

৯ জিলকদ থেকে ১১ জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি।

সত্যায়নকারীগণ:

জামিয়া দারুল উলুম করাচি-এর নায়েবে মুফতিসহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় মুফতিবৃন্দ।

চুড়ান্ত সিল ও রেফারেন্স নম্বর:

'দারুল ইফতা জামিয়া দারুল উলুম করাচি'-এর অফিশিয়াল রেজিস্টার নম্বর ও তারিখ:

•ফতোয়া নম্বর: ৯৪/২৮০৮

তারিখ: ১১ জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি / ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

— স্বাক্ষর ও সিলমোহর —

والله تعالى أعلم بالصواب

(আল্লাহ তাআলাই সঠিক বিষয়ে সর্বাধিক অবগত)

উত্তর সহিহ (সঠিক) এবং মুফাক্কাম (অনুমোদিত)।

দারুল ইফতা, দারুল উলুম করাচি

তারিখ: ৯ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি / ২৭ এপ্রিল ২০২৬ ইংরেজি

(একাধিক মুফতি ও শায়খুল হাদিসের স্বাক্ষর ও সিলমোহর দ্বারা অনুমোদিত)

— সমাপ্ত —

بفقد أسر السلطان فيها بعد
الجباب مع
عبد الله بن علي
عبد الله بن علي
دار القادسية دار العلوم كرتي
دار القادسية / ٩ / ١٣٣٤
٢٤ / أبريل / ٢٠٢٦



11/11/2015

الجواب صحيح
شاه محمد تقي
11/12/1425



الرجاء
١٠/٥/١٤٤١هـ

السلامة
منه
١٠/١١/١٩٩٩





তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

এই গবেষণা কর্মটি সংকলন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব, ফতোয়া গ্রন্থ এবং সরকারি নথিপত্রের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে:

1. **আল-কুরআনুল কারীম:** ইসলামের মূল উৎস এবং সকল বিধানের ভিত্তি।
2. **আহকামুল কুরআন** — ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) [৩৬০-৩৭০ হি.]: ফিকহুল কুরআনের ওপর রচিত অন্যতম মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।
3. **সহিহ মুসলিম ও তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম** — মুফতি মুহাম্মদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ): সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ কর্তৃক রচিত 'সহিহ মুসলিম'-এর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আধুনিক মাসায়েলের দালিলিক সমাধানের আধার।
4. **আদ-দুররুল মুখতার মাতা রদদুল মুহতার (ফাতওয়ায়ে শামি)** — ইমাম ইবনে আবিদিন শামি (রহ.) [১২৩৮-১২৫২ হি.]: হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য রেফারেন্স গ্রন্থ।
5. **আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর** — ইমাম ইবনে নুজাইম হানাফি (রহ.) [মৃত্যু: ৯৭০ হি.]: ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি ও দর্শনের ওপর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ।
6. **জাওয়াহিরুল ফিকহ** — মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) [১৮৯৭-১৯৭৬ খ্রি.]: পাকিস্তান ও উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফতি ও মুফাসসির কর্তৃক রচিত ফিকহি গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংকলন।
7. **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (The Child Marriage Restraint Act, 2017):** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট।
8. **পাঞ্জাব চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অর্ডিন্যান্স, ২০২৬ (Punjab Child Marriage Restraint Ordinance, 2026):** পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাঞ্জাব প্রদেশের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ আইনি অধ্যাদেশ।
9. **মাকতাবায়ে শামেলা (Maktaba Shamela):** ইসলামি কিতাবসমূহের বিশ্ববিখ্যাত ডিজিটাল লাইব্রেরি।
10. **জামিয়া দারুল উলুম করাচি (অফিসিয়াল ওয়েবসাইট):** সমকালীন ফতোয়া ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের নির্ভরযোগ্য অনলাইন উৎস।



NOOR
Publication

সম্পাদক পরিচিতি

হাফেজ মাওলানা নূর মুহাম্মদ মূলত একজন নিভৃতচারী দ্বীনি গবেষক, নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ এবং আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার এক অনন্য সমন্বয়। দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী ইলমি মারকাজ আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী থেকে ‘দাওরায়ে হাদিস’ (মাস্টার্স) সম্পন্ন করার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক বিনিয়াদ গঠিত হয়। দীর্ঘ সময় তিনি হিফজুল কুরআন ও উচ্চতর কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাধারার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করেছেন।

নূর মুহাম্মাদের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রথাগত উচ্চশিক্ষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বীনি ও আধুনিক একাডেমিক শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ে তিনি বিশ্বাসী। উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা সমাপ্তির পরেও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিজেকে ঋদ্ধ করার মানসে তিনি বর্তমানে একাডেমিক শিক্ষার এক নতুন ধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর এই পথচলা মূলত একজন আজীবন শিক্ষার্থীর নিরন্তর জ্ঞান-সাধনারই বহিঃপ্রকাশ, যা তাঁকে দ্বীনি ইলম ও সমকালীন প্রজ্ঞার এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করেছে।

পেশাগত জীবনে তিনি যেমন আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সক্রিয়, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইমামতি ও খতিবের মহান জিম্মাদারি পালনের সমান্তরালে তিনি করপোরেট অঙ্গনে সহকারী ব্যবস্থাপক, অর্থায়ন ও হিসাবরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানে ‘অপারেশনস ম্যানেজার’ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মজীবনের এই বৈচিত্র্য তাঁকে ধ্রুপদী ইসলামী মূল্যবোধ ও বৈশ্বিক আধুনিকতার এক সমন্বিত অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে।

ইলমি কিতাবের নিবিড় পাঠ এবং ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের সমসাময়িক জটিল ইস্যুগুলোর দালিলিক বিশ্লেষণ তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। ইতিপূর্বে তাঁর সংকলিত গবেষণামূলক কাজ ‘মাসায়েলে কুরবানি’ আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘বইটই’ (Boitoi)-তে ই-বুক আকারে প্রকাশিত হয়ে বোদ্ধা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

“বাল্যবিবাহ ও সাবালকছের শরয়ি বয়সসীমা: রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সীমানা ও দারুল উলুম করাচির ফতোয়া” তাঁর দ্বিতীয় তাত্ত্বিক খিদ্মত। বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম করাচির নির্ভরযোগ্য ফতোয়াসমূহকে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুচারুভাবে উপস্থাপন করা তাঁর এই প্রয়াস আধুনিক আইনের সাথে শরিয়তের যৌক্তিক সামঞ্জস্য অনুধাবনে একটি দিকনির্দেশনামূলক দলিল হিসেবে কাজ করবে। ব্যক্তিগত জীবনে শৌখিন আলোকচিত্রী ও ভ্রমণপিপাসু এই গবেষক বর্তমানে উম্মাহর প্রয়োজনে আরও বেশ কিছু মৌলিক ও তাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন।

